21 August, 2024

বণিক বার্তা

আলোকপাত

সৈয়দ আবুল বাশার

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা অনেক বিষয়ে মতভেদ করলেও একটি বিষয়ে তারা একমত মেয়েদের শিক্ষা সামাজিক সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ সত্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গত কয়েক দশকে দেশে মেয়েদের শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

শিক্ষার এ অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার কমেছে, মহিলাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নত হয়েছে। শিক্ষিত মেয়েরা বাল্যবিবাহ ও কিশোর বয়সে মা হওয়ার ঝুঁকি থেকে বেশি মুক্ত থাকছে, যা মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমাতে সাহায্য করছে। তারা বেশি আয় করতে পারছে, যা পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নত এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করছে।

শিক্ষিত নারীরা সাধারণত ছোট পরিবার গঠন করতে পছন্দ করছে, যা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করছে। তাদের সন্তানেরাও বেশি সুবিধা পাচ্ছে—টিকা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকছে এবং অপুষ্টির শিকার হওয়ার ঝুঁকি কম থাকছে। এছাড়া শিক্ষিত নারীরা শ্রমবাজারে প্রবেশ করে দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তবে এ অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এখনো রয়েছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ও দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। সাম্প্রতিক করোনা মহামারী এ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে, ফলে অনেক মেয়ে স্কুলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছে। এছাড়া শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সমাগম, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকদের বেসরকারি খাতে চলে যাওয়ার প্রবণতা নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো নানা উদ্যোগ নিয়েছে। উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, স্কুলে স্যানিটেশন সুবিধা উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান। তবে এসব প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৯৭০ সালে যেখানে ২৮ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেত না, ২০১৬ সালে সেই হার কমে ৯ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো প্রায় ৬৩ মিলিয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশু স্কুলে যায় না। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই সংখ্যা আরো বেশি, ২০০ মিলিয়ন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় স্কুলে ভর্তির হার বাড়লেও অনেক শিশু স্কুল ছেড়ে দেয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ল্যান্ট প্রিচেট মন্তব্য করেছেন, আজকের দিনে অশিক্ষিত শিশু খুঁজতে হলে তাদের স্কুলেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

তবে গবেষণা দেখাচ্ছে, শিক্ষার মান খারাপ হলেও স্কুলে যাওয়া শিশুর জন্য উপকারী। সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের জাস্টিন স্যান্ডেফার বলেন, 'স্কুলে গেলে শিশুরা পরবর্তী জীবনে বেশি আয় করতে পারে, অকৃষি কাজে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলে যাওয়া মেয়েরা বিয়ে ও সন্তান জন্ম দেয়া বিলম্বিত করে, এমনকি যেসব দেশে শিক্ষার মান খুবই খারাপ। নাইজেরিয়ায় দেখা গেছে, একটি অতিরিক্ত বছর স্কুলে পড়া মেয়েদের গড়ে শূন্য দশমিক ২৬টি কম সন্তান জন্ম দেয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ধরনের ফল ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া, উগান্ডা ও কেনিয়ায়ও পাওয়া গেছে। সুতরাং বাংলাদেশে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি সব শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক সক্রেটিস লিখন পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে লিখিত শব্দ শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দেবে, কারণ তারা তথ্য বাইরে সংরক্ষণ করতে পারবে এবং মুখস্থ করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। আজ আমরা কম্পিউটার ব্যবহার নিয়ে একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কিন্তু গবেষণা দেখাচ্ছে যে হাতে লেখার অনেক সুবিধা রয়েছে।

২০১৪ সালে প্যাম মুয়েলার এবং ড্যানি ওপেনহাইমার একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করেন। তাদের গবেষণায় দেখা যায় যে হাতে লিখলে শিক্ষার্থীরা তথ্য বেশি মনে রাখতে পারে এবং জটিল ধারণাগুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে। টাইপ করার তুলনায় হাতে নোট নেয়া শিক্ষার্থীদের তথ্যকে নিজের ভাষায় সংক্ষেপায়িত করতে বাধ্য করে, যা বিষয়বস্তু আরো গভীরভাবে বোঝাতে সাহায্য করে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ভার্জিনিয়া বার্নিঙ্গারও হাতে লেখার পক্ষে যুক্তি দেন। তিনি বলেন, হাতে লেখা, কার্সিভ লেখা এবং টাইপ করা এ তিনটি পদ্ধতিরই নিজস্ব সুবিধা রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের এই তিনটি পদ্ধতিতেই দক্ষ হওয়া উচিত। এজন্যই আমার এক সিনিয়র সহকর্মী ক্লাসে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার না করে হাতে লিখে ক্লাসে পড়ান।

কভিড-১৯ মহামারী শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বিশ্বব্যাপী স্কুল বন্ধের কারণে প্রায় ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ পরীক্ষা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লি এলিয়ট মেজর জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডে শিক্ষকরা ছাত্রদের মূল্যায়নের দায়িত্ব পেয়ে স্বস্তিবোধ করেননি। অন্যদিকে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যান্ড্রা মিলিগান মনে করেন, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তবে যারা খারাপ ফল করবে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই সংকট পরীক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা উভয়ই তুলে ধরেছে। উল্লেখ্য, সব শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই সম্ভব নয়; বিভিন্ন পটভূমির শিক্ষার্থীদের সাফল্যের সুযোগ দেয়ার জন্য মূল্যায়নের একটি পোর্টফোলিও থাকা উচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ভূমিকা পুনর্বিবেচনা এবং বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি অন্বেষণ করা প্রয়োজন, যাতে সব শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায্য ও কার্যকর মূল্যায়ন নিশ্চিত করা যায়।

কভিড-১৯ মহামারী বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। এমআইটির জাস্টিন রাইগের মতে, অধিকাংশ পরিবারের জন্য অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা হতাশাজনক থেকে বিপর্যয়কর পর্যন্ত ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা গড়ে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক কম শিখেছে। বিশেষ করে যারা আগে থেকেই পিছিয়ে ছিল, তারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এ সংকট শিক্ষকদের অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। এছাড়া কিছু শিক্ষার্থী অনলাইন শিক্ষায় ভালো ফল করেছে, বিশেষ করে যারা উদ্বেগ বা বুলিংয়ের শিকার হয়। এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও নমনীয় করার সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষাবিদরা মনে করছেন যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওইসিডির আন্দ্রেয়াস শ্লাইখার বলেন, 'সব শিক্ষার্থীকে একই ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়, তাই শিক্ষার ফল সামাজিক পটভূমির ওপর নির্ভর করে। তিনি মনে করেন, স্কুলগুলোকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশে কাজ করতে হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পল রেভিল যুক্তি দিয়েছেন, স্কুলগুলোকে "কারখানা মডেল" থেকে সরে এসে "চিকিৎসা মডেল"-এ যেতে হবে, যেখানে ধরে নেয়া হবে যে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রয়োজন। এ ধারণাগুলো বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করে, আমরা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করতে পারি, যা তাদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করবে এবং শিক্ষায় বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই উন্নয়নশীল দেশগুলোয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেনিয়ার উদ্যোক্তা টোনি নদুন্ডু দুটি এআইচালিত অ্যাপ তৈরি করেছেন যা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং শিক্ষকদের পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করবে। এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশেও শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রেও এআই ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। কেনিয়ায় একটি ভার্চুয়াল স্বাস্থ্যসেবা প্লাটফর্ম এআই-চালিত চ্যাটবট ব্যবহার করে রোগীদের প্রাথমিক পরামর্শ দিচ্ছে। এটি নার্সদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে, যাতে তারা আরো বেশি রোগীকে সেবা দিতে পারেন। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে চিকিৎসকের সংখ্যা কম, এ ধরনের প্রযুক্তি স্বাস্থ্যসেবায় প্রসারে সহায়ক হতে পারে।

এছাড়া এআই কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন যে এআই ব্যবহার করে স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে ফসলের ফলন সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। এটি কৃষকের সঠিক সার ব্যবহার ও উপযুক্ত বীজ নির্বাচনে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।

তবে এআই ব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সরকারগুলো এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের নজরদারি করতে পারে। এছাড়া ভুয়া ভিডিও বা ডিপফেক ব্যবহার করে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বাংলাদেশকে এই ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এআই ব্যবহারে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পরিশেষে ল্যান্ট প্রিচেট তার গবেষণায় শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত শিখন, কেবল স্কুলে উপস্থিতি নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এরই মধ্যে শুরু হয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক। প্রিচেট মনে করেন, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দ্রুত শিক্ষার মান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। তবে তিনি এও জোর দিয়েছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর পরিবর্তন আনতে হলে অভিভাবক ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। তার মতে, একটি বিকেন্দ্রীভূত, স্থানীয়ভাবে দায়বদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিক কার্যকর হবে, যা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। তবে প্রিচেট স্বীকার করেছেন যে এ ধরনের পরিবর্তন আনতে সময় লাগবে এবং এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া হবে। এ প্রক্রিয়ায় সব অংশীদারের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, নীতিনির্ধারক এবং সমাজের অন্য সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট, বাংলাদেশের উন্নয়নে শিক্ষার, বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং অন্যান্য সফল দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, বাংলাদেশ তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ, প্রযুক্তি বিশেষত এআইয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার, অভিভাবক ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত এবং শিক্ষার মান নিয়মিত মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা। এই পদক্ষেপগুলো শুধু শিক্ষা খাতেই নয়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা একটি সমৃদ্ধ ও সুখী বাংলাদেশ গড়ার পথে অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এখনো রয়েছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ও দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। সাম্প্রতিক করোনা মহামারী এ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে, ফলে অনেক মেয়ে স্কুলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছে। এছাড়া শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সমাগম, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকদের বেসরকারি খাতে চলে যাওয়ার প্রবণতা নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো নানা উদ্যোগ নিয়েছে। উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, স্কুলে স্যানিটেশন সুবিধা উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান। তবে এসব প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা প্রয়োজন

সৈয়দ আবুল বাশার : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

[এ প্রবন্ধটি লেখার জন্য আমি দি ইকোনমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধ থেকে সাহায্য নিয়েছি।]